গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১৬ সংখ্যা | ২ - ৮ ডিসেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জন্মশতবর্ষে
কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

"মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব, যা আজকের যুগে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ বা ভাবাদর্শ এবং যা বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের পঙ্গুতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে একটা নতুন শোষণহীন শ্রেণিহীন উন্নততর সমাজব্যবস্থার জন্ম দিতে সক্ষম।"

— কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল

নির্বাচন কমিশন সরকার-ভজা জানা কথাটাই উঠে এল সুপ্রিম কোর্টে

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে যে অবিশ্বাস, অনাস্থার কথা এতদিন অহরহ শোনা যেত, এবার সেই একই কথা শোনা গেল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মুখে। সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের নিয়োগের পদ্ধতি এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে অরুণ গয়াল নামে এক আমলাকে। তিনি ভারী শিল্প মন্ত্রকের সচিব ছিলেন। তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ৩১ ডিসেম্বর। কিন্তু ১৮ নভেম্বর তিনি স্বেচ্ছাবসর নেন। আর পরের দিনই তাঁকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়। যে বিদ্যুৎ গতিতে এই নিয়োগ করা হয়েছে, তাতে স্বাভাবিক ভাবেই নিয়োগ পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য নিয়ে বিচারপতিদের সন্দেহ দৃঢ় হয়। নির্বাচন কমিশনের এই পদটি মে মাস থেকে খালি পড়ে ছিল। তা হলে হঠাৎ এত তড়িঘড়ি এক দিনের মধ্যে এমন ভাবে নিয়োগের প্রয়োজন হল কেন? বিচারপতি অজয় রাস্তোগি প্রশ্ন তুলেছেন, 'যে দিন আবেদন জমা পড়ল, সে দিনই গৃহীত হল, সে দিনেই নিয়োগ হল, ফাইল পাশ হতে ২৪ ঘণ্টাও লাগল না। কী রকম যাচাই হল?' বিচারপতিদের বেঞ্চ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সরকারের থেকে নিয়োগের ফাইল চেয়ে পাঠায়।

স্বাভাবিক ভাবেই জনমনেও এই প্রশ্ন উঠেছে যে, একজন আমলাকে এমন তড়িঘড়ি স্বেচ্ছাবসর করিয়ে কমিশনার পদে বসানো হল কেন? দেশে কি এই পদে বসার মতো যোগ্য লোকের অভাব পড়ে গিয়েছিল? এই প্রশ্নও উঠছে যে, বিজেপি ঘনিষ্ঠ এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রিয়পাত্র হিসাবেই কি তাঁকে বেছে নেওয়া হল?

একজন নির্বাচন কমিশনার ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত পদে থাকতে পারেন। ২০২৫-এ বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ শেষ হলে গয়ালই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হবেন এবং ২০২৭ পর্যন্ত এই দায়িত্বে থাকবেন। এ কথা আজ আর কারও অজানা নয় যে, নিজেদের অনুগত লোকদেরই বিজেপি সরকার নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে এই দীর্ঘ সময়ের

সাতের পাতায় দেখুন

প্রতিদিন মিলছে বোমা
রাজ্যে প্রশাসন আছে তো!

খবরের কাগজে কোনও না কোনও জেলায় বোমা ফেটে মানুষের প্রাণহানির খবর নেই এমন একটা দিন পাওয়া এখন পশ্চিমবঙ্গবাসীর অসাধ্য। গত কয়েক মাসে কত শিশু যে বল ভেবে বোমায় হাত দিয়ে প্রাণ হারিয়েছে অথবা চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে তার সংখ্যা সঠিকভাবে কে বলবে? এই বেআইনি বোমার বিস্ফোরণের আওয়াজই যে এ রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের আগমনী সূচিত করছে তাতে রাজ্যবাসীর সন্দেহ নেই।

এরই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শাসক এবং হরেক বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের আস্ফালন। কেউ বলছেন গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব, কেউ হাত-পা কেটে নেওয়ার নিদান দিচ্ছেন। এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছিল বেআইনি অস্ত্র এবং বোমা ধরার জন্য তিনি পুলিশকে দল বিচার করতে বারণ করেছেন। বলেছিলেন, সমস্ত বোমা ও অস্ত্রের ভাণ্ডার নির্মূল করতে হবে। এইরকম একটি রুটিন কাজ করার জন্য পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর জনসমক্ষে দেওয়া বিশেষ নির্দেশের দিকে চেয়ে বসে থাকবে কেন, সে প্রশ্ন না হয় আপাতত সরিয়ে রাখা যাক। কিন্তু নির্দেশ যাই হোক, তা শুনতে যতই ভাল লাগুক প্রতিদিন যে পরিমাণ বেওয়ারিশ বোমা, বা অসতর্কতায় ফেটে যাওয়া বোমার স্তূপের কথা জানা যাচ্ছে, তাতে ওই ভাণ্ডারের পর্বতপ্রমাণ চেহারাটা ভাবলেও আতঙ্ক হয়। এই ভাণ্ডারের অনেকটা যেমন ব্যবহার হবে বিরোধীদের উপর, আবার শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেও তা কাজে লাগছে। পুলিশ জানে

দুয়ের পাতায় দেখুন

ইরানের জনগণের সংগ্রামের প্রতি সংহতি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ইরানে ধর্মীয় বন্ধনের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে নারীর মুক্তি এবং ফ্যাসিবাদী শাসন উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফ্যাসিবাদী ইসলামিক শাসনের বিরুদ্ধে সে দেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণ, বিশেষ করে নারী ও যুবকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি আমাদের পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করছি।

সারা দেশের সঙ্গে কলকাতাতেও বিক্ষোভ মিছিল। এসপ্ল্যানেড, ২৫ নভেম্বর

ইরানের তথাকথিত 'ধর্মীয় নীতি পুলিশ' দ্বারা ১৬ সেপ্টেম্বর এক ইরানি মহিলার নৃশংস হত্যাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে এবং তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, ইরানের মহিলারা নির্মম মৌলবাদী নৃশংসতার মোকাবিলা করে এই আন্দোলনের সূচনা করেন এবং পরবর্তী সময়ে সে দেশের ইসলামী ফ্যাসিবাদী শাসনের দ্বারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে শোষিত সকল অংশের জনগণ এতে যোগদান করে। এই আন্দোলন দমন করতে ইরানের ফ্যাসিবাদী শাসকরা লাগামহীন পুলিশি নৃশংসতা, গণহত্যা এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করছে, চারশোর বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, কয়েকশো মানুষকে আহত করেছে এবং মহিলা ও শিশু সহ হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করে রেখেছে। কিন্তু ইরানের অদম্য জনগণ দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে সকল নৃশংসতাকে মোকাবিলা করে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এই ন্যায়সঙ্গত ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করতে এবং ফ্যাসিবাদী শাসকদের দ্বারা সমস্ত দমনপীড়ন বন্ধের দাবি উত্থাপন করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করছি।

২৫ নভেম্বর ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে ইরানের জনগণের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে দেশের সব রাজ্যের রাজধানী শহরে সভা ও মিছিল সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে 'ইরানের সংগ্রামের প্রতি সংহতি দিবস' পালন করার জন্য দেশের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

ইরানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিয়ে নিবন্ধ তিনের পাতায়

রাজ্যে প্রশাসন আছে তো

একের পাতার পর

গদিতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের জনসমক্ষে অনেক কথা বলতে হয়, কিন্তু তার পিছনের ইঙ্গিতটি একেবারে না বুঝে সত্যি সত্যি শাসকদলের অস্ত্র এবং বোমার ভাণ্ডারে হাত দেওয়ার মতো আহাম্মকি দেখাবেন—এমন ওসি থেকে আইপিএস স্তরের অফিসার খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এমনটি হলে তাঁর আর পুলিশে চাকরি করা চলে না। এ সত্য মনে প্রাণে জানেন এবং মন্ত্রের মতো জপ করে থাকেন সব জমানার সব রাজ্যের পুলিশ কর্তারা। খুব বাড়াবাড়ি কিছু ঘটে গেলে তাঁরা কদিন দৌড়োদৌড়ি করে জনরোষ চাপা দেবার চেষ্টা করেন, তারপর সব থিতিয়ে গেলে যা চলছিল চলতেই থাকবে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখা গেছে বীরভূমের বগটুইতে। অতীতে সিপিএম জমানা কিংবা তার আগের কংগ্রেস জমানার উদাহরণগুলিও রাজ্যবাসী এখনও ভুলতে পারেননি। সিপিএম রাজত্বে নেতাই নন্দীগ্রামের গণহত্যার কথা বহু আলোচিত হলেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নানা জায়গা বিশেষত কুলতলি জয়নগরের গ্রামে গ্রামে প্রথমে কংগ্রেস এবং তারপর সিপিএম কীভাবে বেআইনি অস্ত্র, বোমা ও সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল বানিয়ে সন্ত্রাস ও খুনের রাজনীতি চালিয়েছে, পুলিশকে ব্যবহার করে যথেচ্ছ মিথ্যা মামলায় নির্দোষীদের বছরের পর বছর জেল খাটিয়েছে তা খবরের কাগজওয়ালার সবসময় বলেন না। ওই জেলা এবং অন্য জেলা মিলিয়ে দুশোর বেশি এস ইউ সি আই (সি) কর্মী, নেতা, সমর্থকের প্রাণ গেছে সে সময়। পরবর্তী তৃণমূল জমানাতে অতীতের সেই সমস্ত কংগ্রেস এবং সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা যথারীতি শাসক দলের ছাতার তলায় ভিড় করেছে। ফলে এখনও একই ট্র্যাডিশন চলেছে।

গত বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে সন্ত্রাসের ব্যাপারে তৃণমূল কোনও রাখঢাক করতে রাজি নয়। জেলার পর জেলায় বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত গড়তে তারা মনোনয়ন করতে না দেওয়ার রাস্তা নিয়েছিল। বিরোধীদের গুড়-বাতাসা দিয়ে আপ্যায়নের হেঁয়ালির স্রষ্টা এবং পুলিশকে বোমা মারার নিদান হাঁকা তৃণমূল নেতা এখন জেলে থাকলেও এর কোনও পরিবর্তন হবে এমন আশা করা মুশকিল। যদিও শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবারে বলেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে। কিন্তু গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবং তার পরেও তাঁর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা এলাকা জুড়ে সন্ত্রাসের যে রূপ সাধারণ মানুষ দেখেছে তারপর এ সব কথায় ভরসা রাখার কোনও কারণ আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবেন কি? সমস্যা হচ্ছে সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ করবেন কি, পুরনো সিপিএম জমানার সাথে মিলিয়ে তাঁরা ধরেই নিচ্ছেন এমনটাই স্বাভাবিক। এটাই নাকি রাজনীতি! বড়জোর কে বেশি কে কম এ নিয়ে চায়ের দোকান কিংবা তাসের আড্ডায় আলোচনা চলে। পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে বিরোধীশূন্য বোর্ড করতে সিপিএম সন্ত্রাসের যে ধারা নিয়েছিল তা কখনও সূক্ষ্ম, কখনও সরাসরি পিস্তল, বোমার কারাবার ছিল। খোদ কলকাতা শহরে কর্পোরেশন নির্বাচনে পিস্তল নিয়ে রাস্তার উপর দাপাদাপি মানুষ দেখেছে। গ্রামে গ্রামে বিরোধী দলের সম্ভাব্য প্রার্থীর স্ত্রীর কাছে সাদা থান পৌঁছে দেওয়া, হুমকি দিয়ে বিরোধী পরিবারগুলিকে গ্রামে একঘরে করা বা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা ইত্যাদি নানা ছক তাদের ছিল। অসংখ্য বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত তৈরির জন্য তৃণমূল কংগ্রেস যে যুক্তি দিচ্ছে, আশ্চর্য হলেও তা হুবহু সিপিএমের সাথে মিলে যাচ্ছে— বিরোধীরা প্রার্থী না পেলে আমরা কি দিয়ে দেব? প্রশাসন এবং পুলিশ এ ব্যাপারে তখন যেমন জড় পদার্থের রূপ নিয়েছিল, এখনও তাই।

সারা ভারতেই দলদাস পুলিশ এবং প্রশাসন এই কথাটা শুনতে শুনতে যেন মানুষের কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মানুষ ধরেই নিয়েছে এমনটা ঘটেই চলবে। এ ব্যাপারে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে যতই লাফাক তাদের রাজত্বে ত্রিপুরার পঞ্চায়েত নির্বাচনের সন্ত্রাসের ছবি কি মানুষ ভুলে যাবে? উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, আসাম সহ বিজেপি শাসিত সমস্ত রাজ্যের চিত্রই প্রায় এক। বিজেপি নেতারা বললেই পুলিশ সুপার পর্যন্ত সেখানে বুলডোজার দিয়ে বিরোধী কিংবা সরকারের অপছন্দের লোকেদের ঘরবাড়ি ভাঙার কাজে নেমে পড়েন। এখন পশ্চিমবঙ্গে তারা গণতন্ত্র নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। ভারতে আজ গণতন্ত্রের যা চেহারা তাতে শাসক দল যেমন মনে করে তারাই জনগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, একইভাবে প্রশাসনের আমলা পুলিশের কর্তারাও জানেন কেমন করে শাসকদের তোয়াজ করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে হয়। জনগণ মরল না বাঁচল এ নিয়ে এই দু'পক্ষের কারওরই কোনও মাথাব্যথা নেই।

আজকের দিনে যখন এ রাজ্যের শহর-গ্রাম-মফস্বলে একের পর এক বোমায় শিশুরা প্রাণ হারাচ্ছে, রাজনৈতিক হানাহানিতে নিতান্ত সাধারণ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, সে সময় শুধু অসহায় আক্ষেপই কি আমরা করে যাব? এর সমাধানের একটাই রাস্তা— সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ।

আন্দোলনের অঙ্গীকার পানচাষিদের

সারা বাংলা পানচাষি সমন্বয় সমিতির রাজ্য আহ্বায়ক বিবেক রায় ও রেণুপদ হালদার ২৬ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, পানচাষিদের বাঁচার দাবিতে গুছিতে বাংলা ও মিষ্টি পান ৫০টির জায়গায় ৭০/৮০ টি ও ২০০/ ২৫০টি নেওয়া বন্ধকরা, ২০ শতাংশ বা তার বেশি দামভাঙা বন্ধকরা, বর্ধিত আড়ৎদারি প্রত্যাহার, পান নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা, পান অধ্যুষিত এলাকায় পানবাজার নির্মাণ, বুকিং সমস্যার সমাধান এবং পানের সহায়ক মূল্য সহ কৃষিপণ্য হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে সারা বাংলা পানচাষি সমন্বয় সমিতির নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে।

২০১৭ সালে আড়তদারি ৫ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ করার চেষ্টা হলে পানচাষিদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ নেয়। আন্দোলনের চাপে প্রশাসনিক নির্দেশে ৩ শতাংশ বর্ধিত কমিশন বাতিল হয়। অন্যান্য জুলুমবাজিও অনেকাংশে কমাতে বাধ্য হয়। নতুন পান বরজের জন্য এনরেগা প্রকল্প থেকে ১,৩৯,০০০ টাকা অনুদান চালু হলেও এখন তা বন্ধ। পানচাষিদের উল্লিখিত দাবিগুলির সমর্থনে বিভাগীয় মন্ত্রীর নিকট পাঠানোর জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে।

আন্দোলন যখন চলছে, ঠিক তখনই দেখা গেল, পানচাষিদের স্বার্থ রক্ষার নামে ২ মাস আগে গড়ে ওঠা একটি পানচাষি সংগঠন বাংলা ও মিষ্টিপান গুছিতে ৫০টির জায়গায় ৬০/৭০ এবং ১০০/১৩০টি চালুর দাবিতে ২১ নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকাল পানচাষি ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটের দু'দিন আগে পানব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যুগ্মভাবে সরকারের কাছে ওই দাবি তুলে ধরার লক্ষ্যে চাষি ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়।

পানচাষিদের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের নামে এই অপরিণামদর্শীতার বিরুদ্ধেসারা বাংলা পানচাষি সমন্বয় সমিতির নেতৃত্বে পানচাষিরা নতুন প্রেরণায় আন্দোলনের অঙ্গীকার করেন। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ও এলাকা ভিত্তিক পানচাষি কমিটি গঠন করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সম্মতিনগর লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড সেখ আব্দুল ওয়াসেক ৭ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

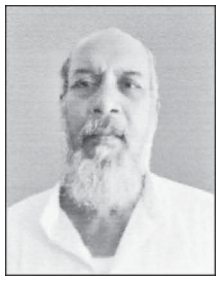

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান কমরেড ওয়াসেক খুব ছোট বয়সে বিড়ি শ্রমিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। সেই সুবাদে ১৯৬০-এর দশকে তিনি দলের শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত জঙ্গিপুর সাব-ডিভিশনাল বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হন। দলের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় নেতা কমরেড অচিন্ত্য সিংহের মাধ্যমে তিনি দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং কাজ শুরু করেন। দারিদ্রের কারণে কখনও রাজমিস্ত্রি, কখনও মজুরের কাজ করতে করতেই পরিবারের সদস্যদের দলের সমর্থকে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দলের প্রায় সমস্ত কর্মসূচিতে তিনি সাধ্যমতো অংশ নিতেন। এলাকার সাধারণ মানুষের কাছেও দলের বক্তব্য নিয়মিত নিয়ে যেতেন। জীবনের শেষ দিকে অসুস্থতার কারণে সেভাবে কাজ করতে না পারলেও নিয়মিত দলের খোঁজখবর নিতেন। হাসপাতালে ভর্তির আগের দিনেও সম্মতিনগর পার্টি অফিসে এসেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে মাল্যদান করেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস মির্জা নাসিরুদ্দিন, অনুরাধা ব্যানার্জী, রবিউল আলম সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। সম্মতিনগর অফিসে মরদেহ নিয়ে গেলে সেখানে দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা মাল্যদান করে তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরদিন তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড ওয়াসেকের মৃত্যুতে দল হারাল একজন মূল্যবোধসম্পন্ন, একনিষ্ঠ, মননশীল কর্মীকে। সাধারণ মানুষ হারাল তাদের আপনজনকে।

কমরেড সেখ আব্দুল ওয়াসেক লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার দক্ষিণ বারাশত লোকাল কমিটির দীর্ঘদিনের সদস্য কমরেড সুনীল ভট্টাচার্য ১৮ নভেম্বর ৮৮ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

পাঁচের দশকের শুরুতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জননেতা প্রয়াত কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সংস্পর্শে এসে দক্ষিণ বারাশত অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী হরিনারায়ণপুর অঞ্চলের একাধিক গ্রামে দলের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

কলকাতায় জুট মিলে কাজ করার সুবাদে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথেও অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিগত ৪-৫ বছর দলের কাজে তেমনভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও প্রতি সপ্তাহে দ্রুত গণদাবী হাতে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। দলের কর্মসূচি ছাড়াও গণসংগঠন ও শাখা সংগঠনগুলির আন্দোলন সম্পর্কেও খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন। নিজ পরিবারকেও দলের কাজে উৎসাহিত করতেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর স্থানীয় কমরেডরা তাঁর বাড়িতে ছুটে যান। রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুবীর দাস মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। দুপুরে শেষযাত্রার পথে প্রথমে ইউথ রানার ক্লাবের পক্ষ থেকে (ওই ক্লাবের তিনি সভাপতি ছিলেন) মাল্যদান করা হয়। দক্ষিণ বারাশত পার্টি অফিসের কাছে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান লোকাল সম্পাদক কমরেড দিব্যেন্দু মুখার্জী ও অন্য কর্মীরা। দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ৪ ডিসেম্বর তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে।

কমরেড সুনীল ভট্টাচার্য লাল সেলাম

ইরানের মানুষের লড়াই মৌলবাদ-ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যেই

ইরান জুড়ে ২সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মশাল জ্বলছে। তার দিকে তাকিয়ে আছেন গোটা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। হিজাব ঠিকমতো না পরার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ২২ বছরের তরুণী মাহসা আমিনির মর্মান্তিক মৃত্যু যে আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে তা আজ গোটা দেশের সাধারণ মানুষের নিজস্ব আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। নারী-পুরুষ-ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী নির্বিশেষে সমাজের সমস্ত অংশের ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণে এই গণআন্দোলনের শক্তি এতটাই বেড়েছে যে তা ক্ষমতাসীন মৌলবাদী-ফ্যাসিবাদী শাসকের চোখে চোখ রেখে অত্যাচারী জমানা বদলের আওয়াজ তুলছে। রাষ্ট্রের দমনপীড়নে ইতিমধ্যেই চারশোর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ৪০ জনই শিশু। বোঝা যায় সপরিবারে মানুষ আন্দোলনে সামিল। পুলিশের আক্রমণে হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। গ্রেপ্তার হয়েছেন অসংখ্য মানুষ।

আগরতলা, ত্রিপুরা

সে সব মোকাবিলা করে আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের আশা-ভরসার এমন এক প্রতীকে পরিণত হয়েছে যে, সাম্প্রতিক বিশ্বকাপ ফুটবলে ইরানের ফুটবলাররাও রাষ্ট্রের দমন-পীড়নের প্রতিবাদে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় কণ্ঠ মেলাননি। ইরানি দর্শকরা গ্যালারিতে প্রতিবাদী পোস্টার তুলে ধরেছেন। সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনতার এই সংগ্রামকে বিশ্বের মানুষ কুর্নিশ জানাচ্ছেন। সংগ্রামী অভিবাদন জানাচ্ছেন।

পশ্চিম ইরানের সাকেজ শহরে মাহসা আমিনির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে চোখের জলকে ঘৃণায় রূপান্তরিত করে হাজার হাজার মানুষ শপথ নিয়েছেন, 'প্রিয় আমিনি, তুমি মরবে না, তোমার নাম হবে প্রতিরোধের প্রতীক'। তারপর সমবেত জনতা গর্জে ওঠে 'ডিক্টেটর নিপাত যাক'।

আমিনির মৃত্যুকে যদি ক্ষোভের বারুদে অগ্নি সংযোগ ধরা হয় তা হলে জনমানসে এত ক্ষোভের কারণ কী? আর এই বিক্ষোভে মহিলারাই তো পথিকৃৎ। তাদের অবস্থাই বা কী?

ধর্মীয় মৌলবাদী শাসনে
মহিলাদের দুঃসহ অবস্থা

জার্মান সংবাদপত্র 'আনজেরে জাইট'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের বামপন্থী দল 'তুদে পার্টি'র আন্তর্জাতিক মুখপাত্র মহম্মদ ওমিদভার জানাচ্ছেন, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইরানে ৪০ শতাংশের বেশি জনগণ দারিদ্র সীমার নিচে। বেকারত্ব ভয়াবহ, কোনও কোনও প্রদেশে তা ৭০ শতাংশের বেশি। এর সঙ্গে জুড়ে আছে শাসকদের সীমাহীন দুর্নীতি। আর চলছে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের নির্মম দলন। সৌদি আরবের শাসকরা এবং আফগানিস্তানের তালিবানরা মহিলাদের উপর যে ধরনের ফতোয়া জারি করেছে, ইরানেও তাই। মানুষ হিসাবে যে বুনিয়াদি অধিকার থাকা উচিত, তার কিছুই ইরানের মহিলাদের নেই। এমনকী তার নিজের শরীরের উপর নিজের অধিরকারটুকুও নেই।

ইরান ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারা শাসিত একটি পুঁজিবাদী ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র। এ যে কী দুঃশাসন ইরানের জনগণ বিশেষ করে মহিলারা তা উপলব্ধি করছেন জীবন দিয়ে। মৌলবাদী শাসকরা মেয়েদের বিয়ের বয়স ধার্য করেছিল ৯ বছর। জনগণের প্রবল প্রতিবাদের সামনে পড়ে ২০০২ সালে পার্লামেন্ট মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে করে ১৩ বছর। অধিকারের প্রশ্নে নারী-পুরুষের বৈষম্য ব্যাপক। পুরুষেরা মুখে তালাক বললেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু নারী বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলে তাকে যেতে হবে কোর্টে। একজন বিবাহিত মহিলা বিদেশে যাওয়ার পাসপোর্ট পাবে না, যদি না স্বামী লিখিত অনুমতি দেয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার নগণ্য, মাত্র সাড়ে ১২ শতাংশ। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে, তার সম্পত্তি পুরোটাই পাবে স্বামী। পৈত্রিক সম্পত্তিতে মেয়ের ভাগ ছেলেদের অর্ধেক। বিচারবিভাগে মেয়েদের চাকরির কোনও অধিকার নেই। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও মেয়েদের দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। কোনও কোনও ধর্মীয় নেতা এমনও বাণী দিচ্ছে যে মহিলাদের মস্তিষ্কের শক্তি পুরুষের অর্ধেক। কথাগুলি হঠাৎ শুনলে বিজেপি আর এস এসের নেতাদের মুখ নিঃসৃত বাণী বলে মনে হয়। আসলে হিন্দু মৌলবাদই হোক বা মুসলিম মৌলবাদ— সব মৌলবাদের বহিরঙ্গে পার্থক্য যাই থাক, মর্মবস্তুতে এরা এক। এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

আর্থিক সঙ্কটের বিরুদ্ধে
ধারাবাহিক সংগ্রাম

২০১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর তুদে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দেশবাসীদের উদ্দেশে বিবৃতি দেয়। তাতে বলা হয়, "ধর্মীয় মৌলবাদ শাসিত ইরানে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধিতে জনগণ বিপর্যস্ত। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিরা বিলাসী জীবনে মত্ত। দেশের সম্পদ লুঠ করে বিপুল বৈভবের অধিকারী এই শাসকরা জনগণকে বলছে, 'সহ্য করো', 'ধর্মীয় শাসনকে রক্ষা করো'— কিন্তু এসব বাণী জনজীবনে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু আনেনি। এর বিরুদ্ধে ২০১৭ সালেও মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। বিক্ষোভের অভিঘাত আছড়ে পড়েছিল বিভিন্ন সরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে। সরকার পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে বিচারবিভাগ, ধর্মীয় রক্ষীবাহিনী এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, যাদের মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা, তাদের বিরুদ্ধে

মেছেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

গণবিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মীয় স্বৈরাচার থেকে মুক্তি চায়, চায় দমন পীড়নের অবসান, চায় সামাজিক ন্যায় বিচার। এইসব দাবি আদায় করা সম্ভব বিদেশি প্রভাব মুক্ত হয়ে সমস্ত স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর যুক্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।"

চলমান গণবিক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহম্মদ ওমিদভার আরও বলেন, 'গত দু'বছর ধরে ইরানে বিক্ষোভ আন্দোলন নানাভাবে চলছে। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে অসংখ্য শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হাফ্ট টাপে আখভিত্তিক কৃষিশিল্প কমপ্লেক্স, আরকের হেভি ইক্যুইপমেন্ট প্রোডাকশন, পেট্রোলিয়াম শিল্পের ধর্মঘট, শিক্ষক ধর্মঘট, পেনশনার্সদের ধর্মঘট। জনজীবনে যে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট তার পিছনে রয়েছে উদারবাদী নীতি, যা বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আইএমএফের মদতে গেড়ে বসেছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে আমেরিকার চাপানো বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা'।

বাঙ্গালোর, কর্ণাটক

ইরানের মানুষ বারে বারে আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। ২০০৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রহসনের বিরুদ্ধে মানুষ লড়েছে। কিন্তু ২০১৭-র আন্দোলন নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলন সরাসরি আঙুল তুলেছে পুঁজিবাদ সৃষ্ট দারিদ্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনে শ্রমজীবী নারী পুরুষ এবং বেকার যুবকদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। দাবি ছিল ধর্মীয় প্রজাতন্ত্র নিপাত যাক, সুপ্রিম শাসক খোমেইনির মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, প্রেসিডেন্ট রৌহানির মৃত্যুদণ্ড চাই এবং তথাকথিত রেভলিউশনারি গার্ডদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এই আন্দোলনের বছর খানেক আগে কর্মক্ষেত্রে দুঃসহ পরিবেশ দূর করা এবং বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে ধর্মঘট হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও নার্সরা আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। কারণ ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের কষ্টার্জিত স্বল্প সঞ্চয়ও হারাতে হয়েছিল। সব মিলে ইরান একটা বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরি।

আট কোটি মানুষের দেশ ইরান। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই দেশ। খনিজ তেল, গ্যাস, কয়লা, তামা সহ নানা খনিজ সম্পদ থাকলেও এই সম্পদে জনগণের কোনও অধিকার নেই। তুদে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ইরানের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ২০১৭ সালেই বলেছিল, এই আন্দোলনে আপনাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করুন, জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত দাবিগুলি তুলে ধরুন। অত্যাচারী জমানা বদল, আর্থিক বঞ্চনার অবসানের দাবিতে জাতীয় সম্পদ লুটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। প্রতিক্রিয়াশীল, বিভেদকামী শক্তিগুলিকে এড়িয়ে চলুন। কোনও ভাবেই এই আন্দোলনকে অতীতের মতো হাইজ্যাক হতে দেওয়া যাবে না।

কোন আন্দোলন হাইজ্যাক হয়েছিল? হাইজ্যাক হয়েছিল ১৯৭৮-৭৯ সালের আন্দোলন, যা ইসলামিক রেভোলিউশন নামে খ্যাত। আর্মি জেনারেল রেজা শাহ ১৯২০ সালে ক্ষমতা দখলের পর থেকে তার অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে ধর্মীয় নানা জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বামপন্থী ও মার্কসবাদী গ্রুপ যুক্ত ছিল। ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা খোমেইনি এই আন্দোলনকে হাইজ্যাক করেন। ফলে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে

পাঁচের পাতায় দেখুন

‘লড়তে হবে অধিকারের দাবিতে’
আহ্বান বাঙ্গালোরের মহিলা কনভেশনে

২৫ নভেম্বর দিনটি আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিরোধী দিবস। এই উপলক্ষে এআইএমএসএস ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি নেয়। ২৫ নভেম্বর সংগঠনের বাঙ্গালোর জেলা কমিটি একটি কনভেনশনের আয়োজন করে। প্রধান অতিথি ছিলেন টুমকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ জ্যোতি।

উপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সমাজের পুরনো ধ্যান-ধারণা দিয়ে আদর্শ নারী হওয়ার প্রয়োজন আজ আমাদের নেই। আমাদের লড়তে হবে অধিকারের দাবিতে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মহিলারা আজ নানা আক্রমণের শিকার। পণজনিত আক্রমণ, অ্যাসিড হামলা, অনার কিলিং, দলবদ্ধ ধর্ষণ— এসবের বিরুদ্ধে মহিলাদের সংগঠিত ভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শোভা এস। সভানেত্রী ছিলেন হেমাবতী কে। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে কলেজ, হোস্টেলগুলিতে নারী নির্যাতন বিরোধী কর্মসূচি পালনের ঘোষণা করা হয়।

পুরুলিয়ায় বিক্ষোভ যুবশ্রীদের

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী যুবশ্রীদের সমস্ত সরকারি দপ্তরে গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি-তে অবিলম্বে নিয়োগ, বাজারমূল্য অনুযায়ী উৎসাহ ভাতা বৃদ্ধি, বন্ধ ভাতা পুনরায় চালু, জেলা স্তরে বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে যুবশ্রীদের অগ্রাধিকার, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত সকল বেকারের কাজের দাবিতে ২২ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতি পুরুলিয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে পুরুলিয়া ডিএম দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

অর্ধশতাধিক যুবক এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ডিএম অনুপস্থিত থাকায় এডিএম ডেপুটেশন গ্রহণ করেন। তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। কর্মসূচিটিতে নেতৃত্ব দেন সমিতির রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক প্রণয় সাহা, পুরুলিয়া জেলা সভাপতি জ্যোতির্ময় ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ স্বদেশপ্রিয় মাহাত প্রমুখ। দাবি পূরণ না হলে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়।

পায়রাটুঙি খাল সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ তমলুকে

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক ব্লকে অন্যতম জলনিকাশি ব্যবস্থা পায়রাটুঙি খাল। ১০ বছরেরও বেশি সময় এটির সংস্কার না হওয়ায় গত বছরের অতিবর্ষণে গোটা এলাকা দু'মাসেরও বেশি জলের তলায় ছিল। জল জমে থাকায় চাষাবাদও বন্ধ থাকে। অবিলম্বে খাল সংস্কারের দাবিতে ২৫ নভেম্বর কৃষক সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে তমলুক-পাঁশকুড়া রুটের শ্রীরামপুর বাসস্টপে ওই এলাকার দুই শতাধিক চাষি সহ সাধারণ মানুষ পথ অবরোধ করেন। পরে তমলুক থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং সেচ দপ্তরের এসডিও অবরোধস্থলে উপস্থিত হয়ে আপাতত খালটির আংশিক সংস্কারের আশ্বাস দেওয়ায় অবরোধ ওঠে। অবরোধে নেতৃত্ব দেন কৃষক সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক শশাঙ্ক আদক, সহসম্পাদক অভিজিৎ মাইতি, শম্ভু মান্না, সভাপতি সুদর্শন সামন্ত প্রমুখ। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির নেতা অশোকতরু প্রধান, কৃষক আন্দোলনের নেতা প্রবীর প্রধান উপস্থিত ছিলেন।

তুমুল কৃষক বিক্ষোভে সারের দাম কমাতে বাধ্য হল কৃষিদপ্তর

সারের কালোবাজারি ও অত্যধিক দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে কৃষক

কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ প্রশাসনিক ভবনে ডেপুটেশন

আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন জেলায় প্রশাসন নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হল। উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙা, বাদুড়িয়া, আলিপুরদুয়ার জেলায় কৃষিদপ্তর সারের গোডাউনগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে বস্তার উপর লেখা রেটে সার কেনার ব্যবস্থা করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে চাষিদের লক্ষ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। আন্দোলনের সাফল্যের এই খবর অন্যান্য ব্লকের চাষিদের মধ্যেও আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ব্লকে চাষিরা সার নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করছে।

আলু, সর্ষে সহ অন্যান্য চাষের ভরা মরসুমে সারের চাহিদা এখন তুঙ্গে। এই সুযোগে সার কোম্পানি-সার ব্যবসায়ী-কৃষি দপ্তরের মিলিত চক্র যথেচ্ছভাবে সারের দাম বাড়িয়ে চাষির পকেট কেটে চলেছে। দাম নির্ধারণে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে সারের দাম ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি করেছে কোম্পানিগুলো। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চাষির অ্যাকাউন্টে সামান্য কিছু নগদ দিয়ে চাষিকে বিভ্রান্ত করে কৃষকবন্ধু সাজার ভণ্ডামি করছে। অথচ সার সহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি করে সরকারি ভিক্ষার থেকে বহুগুণ টাকা চাষির পকেট কেটে নেওয়া হচ্ছে। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো প্রশাসনের সহযোগিতায় চলছে সারের কালোবাজারি। সারের ডিলার-ব্যবসায়ীরা সার লুকিয়ে রেখে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে বস্তার উপর লেখা খুচরো দামের চেয়েও বস্তা প্রতি ১০০০-১৫০০ টাকা বেশি দামে চাষিকে সার কিনতে বাধ্য করছে।

কৃষকের এই বিপদের দিনে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস)-এর

উত্তর ২৪ পরগণায় এআইকেকেএমএস-এর প্রতিবাদ মিছিল

উদ্যোগে পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় গড়ে উঠেছে কৃষক আন্দোলন। ২৩ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার হাটে বিক্ষোভ মিছিল করে এআইকেকেএমএস কোচবিহার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি জেলায় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আন্দোলনের চাপে প্রশাসন সক্রিয় হতে বাধ্য হয়েছে। আন্দোলনের এই জয়ে কৃষকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস।

তমলুকে মদ বিরোধী বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুক পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রত্নালি এলাকায় ২২ নভেম্বর একটি মদের দোকান নতুন করে খোলায় এলাকার মানুষজন একজোট হয়ে মদবিরোধী নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান।

বছর পাঁচেক আগে মদের দোকানটি বন্ধের দাবিতে এলাকার মানুষ মদবিরোধী নাগরিক কমিটি গড়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। ব্যাপক আন্দোলনের চাপে প্রশাসন তখন দোকানটি বন্ধ করে দেয়। এদিন আবার দোকানটি খোলার উদ্যোগ হলে বিক্ষুব্ধ মানুষ মিছিল করে জেলাশাসক, আবগারি দপ্তর এবং তমলুক থানায় ডেপুটেশন দেন। কর্মসূচিটিতে নেতৃত্ব দেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নুরুল ইসলাম, সঞ্জয় কর, সূর্য চক্রবর্তী, শম্ভু মান্না, নিতাই প্রামাণিক, অসীমা পাহাড়ী, জাহিদুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বলেন, আমরা কোনওমতেই এই শান্তিপ্রিয় এলাকায় মদের দোকান খুলে পরিবেশ নষ্ট করতে দেব না।

এগরায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

২০ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা মহকুমার বালিঘাই কাস্টমার কেয়ার সেন্টার এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি পরিতোষ গিরি। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন কাস্টমার কেয়ার সেন্টার কমিটির সম্পাদক অরুণ বর। প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন স্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা বক্তব্য রাখেন।

পরিশেষে জেলা সম্পাদক প্রদীপ দাস জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ বিল-২০২২ বাতিলের দাবিতে সর্বস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সম্মেলন থেকে পরিতোষ গিরিকে সভাপতি, অরুণ বরকে সম্পাদক করে ১৭ জনের কমিটি গঠিত হয়।

ইরানে মৌলবাদ বিরোধী লড়াই

তিনের পাতার পর

গণতন্ত্রীকরণের কাজটি হতে পারত, তা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেল। ধর্মীয় মৌলবাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করে ধর্মীয় অন্ধতা ও অনুশাসনের শৃঙ্খলে মানুষকে ক্রমাগত বাঁধতে শুরু করল। অসংখ্য গণতন্ত্রী, বামপন্থী, কমিউনিস্টকে হত্যা, বন্দি বা নির্বাসিত করা হল। ফলে একদিকে পুঁজিবাদী শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনা, অন্যদিকে মৌলবাদী শক্তির ফ্যাসিস্ট বিধান ইরানে কায়েম করল এক ভয়ঙ্কর দুঃশাসন, যার বিরুদ্ধে আবারও জেগে উঠেছে বিদ্রোহের দামামা।

ওড়িশা

এবারের আন্দোলনে তারুণ্যের জোয়ার

২০০৯ এবং ২০১৭ সালের আন্দোলনের থেকে ২০২২-এর এই আন্দোলনে কিশোর কিশোরী ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। এর কারণ প্রধানত দুটো। প্রথমত, এদের সামনে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের নীতি-পুলিশি জনগণকে গ্রহণযোগ্য কিছুই দিতে পারছে না। এর অন্তঃসারশূন্যতা তরুণদের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে। ফলে প্রবীণদের থেকে অনেক বেশি তেজোদীপ্ত হয়ে এরা আন্দোলনের মশাল নিয়ে ধাবমান। এই আন্দোলনকারীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ইরানের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা, খেলোয়াড়রা।

পাটনা, বিহার

ইরান সংহতি আন্তর্জাতিক জোট

ইরানের বিগত আন্দোলনগুলির প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ইন সাপোর্ট অব ওয়ার্কার্স ইন ইরান (আইএএসডব্লিউআই)। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে এই আন্তর্জাতিক জোট এক বিবৃতিতে বলে, ইরানের শ্রমিক শ্রেণি এবং বঞ্চিত মানুষ ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়ের দাবিতে যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, জোট তার পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। ইরানের ইসলাম রিপাবলিক একটি স্বৈরতন্ত্রী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যে উদারনীতিবাদের নামে শ্রমিকদের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে— তার বিরুদ্ধে নিন্দায় বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি, বাম ও প্রগতিশীল শক্তির এগিয়ে আসা উচিত। আমরা মনে করি, এই স্বৈরশাসন যে অপরাধ করে চলেছে তার বিরুদ্ধে বহির্বিশ্বের বামপন্থী শক্তিসমূহের নীরব থাকার কোনও যুক্তি নেই।

ইরানের আন্দোলনে আমেরিকার প্রশাসন ও তার দোসর ইজরায়েল, ইরানের দক্ষিণপন্থী শক্তি এবং রাজতন্ত্রীদের হস্তক্ষেপের আমরা নিন্দা করি। ইরানের আন্দোলনের পাশে বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণি, বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক সংগঠন এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো উচিত, বিবৃতির শেষ বক্তব্যটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। 'অ্যান ইনজুরি টু ওয়ান ইজ অ্যান ইনজুরি টু অল— একজনের উপর আঘাত আমাদের সকলের উপর আঘাত।'

প্রতিবাদ ভারতেরও

শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) ২৫ নভেম্বর সারা ভারতে ইরান সংগ্রাম সংহতি দিবস পালন করে। দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ভারত সহ বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এই ন্যায়সঙ্গত ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানোর আহ্বান জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দিন রাজ্যে রাজ্যে মিছিল মিটিং সংগঠিত হয়। অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনও ইরানের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েছে।

ইরানের এই আন্দোলন দেখিয়ে গেল ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হলেই উক্ত ধর্মাবলম্বী মানুষের জীবনে সুখ শান্তি আসবে একথা সত্য নয়। ধর্মীয় মৌলবাদীরা শোষণমূলক রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ত্ব করে কীভাবে ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করে এবং একমাত্র পুঁজিমালিকরাই এর দ্বারা কীভাবে লাভবান হয়, ইরান তারই অন্যতম উদাহরণ। এটা লক্ষণীয়, মুসলিম মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে মুসলিম জনগণই বুক চিতিয়ে লড়ছে।

হরিয়ানা

গুজরাট গণহত্যা তাঁদেরই কাজ
মানলেন অমিত শাহ

'গুজরাট আমিই বানিয়েছি' বলে প্রচার করছেন প্রধানমন্ত্রী। কেমন গুজরাট বানিয়েছেন তিনি? '২০০২-এ 'ওদের' উচিত শিক্ষা দিয়েছি! পাকাপাকি শান্তি ফিরে এসেছে রাজ্যে!'—অমিত শাহ কথিত এই গুজরাটের কথাই কি বলতে চেয়েছেন মোদিজি?

'ওদের' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে, সকলেই বুঝতে পারছেন। শুধু দেশের মানুষ বুঝতে পারছে না, যে গুজরাট গণহত্যা তাদের নেতৃত্বে সংঘটিত হওয়ার কথা বিজেপি নেতারা সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত অস্বীকার করেছিলেন, তাদের রাজ্য সরকারের ভূমিকায় কয়েক হাজার মানুষ ধনে-প্রাণে মারা গেলেও অভিযুক্ত বিজেপি নেতাদের কোনও শাস্তি হল না, বিজেপি নেতাদের এই ভূমিকার জন্যই সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরবের মৌলবাদী খুনি যে যুবরাজ প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তুলনা শুনতে হল দেশবাসীকে, এইরকম একটা বিষয়কে তাদের শীর্ষনেতা হঠাৎ স্বীকার করে বসলেন কেন?

অমিত শাহ তো এই বলে ভোট চাইতে পারতেন, মোদির 'বানানো' গুজরাট শিক্ষায় এগিয়ে গিয়েছে, বলতে পারতেন সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত হয়েছে গুজরাটে, বেকার যুবকদের চাকরির অনেকখানিই সুরাহা হয়েছে, নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে, চাষিদের আর ঋণগ্রস্ত হতে হচ্ছে না, তারা ন্যায্য মূল্যে সার-বীজ কেনার সুযোগ পেয়ে চাষ করছে, মহিলারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন না।

মোদিজির 'বানানো স্বর্গরাজ্যে' এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল। তা তো বললেন না তিনি। আসলে বলতে পারলেন না। কারণ, বাইরে তাঁরা যতই 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট', 'গুজরাট মডেল' এ সবের প্রচার তুলুন, গুজরাটের মাটিতে এই প্রচারের কানাকড়িও মূল্য নেই। তারা সাধারণ মানুষ-ছাত্র-যুব-কৃষক-শ্রমিক কারও স্বার্থে একটি পদক্ষেপও নেয়নি, দেখেছে পরম বন্ধু একচেটিয়া শিল্পপতি আম্বানি-আদানিদের স্বার্থ। তাই ধর্মের পালে বাতাস দিয়ে এর থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছেন বিজেপি নেতারা। শেষ পর্যন্ত তুরুপের তাস ধর্মীয় মেরুকরণকে আঁকড়ে ধরতে হল বিজেপি নেতাদের।

গুজরাট ভোটে হিন্দু-মুসলিম, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর মধ্যে বিভেদের ভয়ঙ্কর তাস খেলে বাজিমাত করার চেষ্টা করছেন তারা। একমাত্র এ ক্ষেত্রেই তারা নিত্যনতুন কায়দায় 'উন্নয়ন' ঘটিয়ে চলেছেন— কখনও গো-রক্ষার অজুহাতে, কখনও লাভ জেহাদের নামে, কখনও মন্দির-মসজিদ নিয়ে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে। একত্রে বাস করা নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষের পরস্পরের মধ্যে আবেগের দীর্ঘদিনের স্থায়ী সম্পর্ককে ধ্বংস করে তার উপর গড়ে তুলেছেন হিংসা-বিদ্বেষের ভয়াল প্রাচীর। যা দেখিয়ে নির্বাচন এলেই দুটি সম্প্রদায়ের মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়, ভোটে ফয়দা লোটা যায়। তাই বারবার অস্বীকার করে যাওয়া গুজরাট গণহত্যার স্মৃতিকে আবারও উস্কে দিতে হল অমিত শাহকে।

কেন্দ্রে আট বছর এবং গুজরাটে টানা ২২ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও অমিত শাহজি হাজার হাজার বেকার যুবককে চাকরির দিশা দেখিয়ে বলতে পারলেন না ওই দেখো এসে গেছে মোদিজির 'আচ্ছে দিন'! অর্থনীতির 'উন্নয়ন' অবশ্যম্ভাবী বলে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন হাজার আশ্বাসবাণী দিলেও তাতে খিদে মিটছে না গরিব-মধ্যবিত্তের। ছাঁটাই হওয়া কোনও শ্রমিকের জীবনে এতটুকু আশার আলো কেউ দেখাতে পারছে না।

সরকারের ভর্তুকির গল্প শুনে ঋণগ্রস্ত কৃষকদের পেট ভরছে না, মানুষকে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে দেশি-বিদেশি ধনকুবেরদের হাতে চিকিৎসাকে তুলে দেওয়ায় বহুমূল্য এই পরিষেবা কিনতে না পেরে মায়েরা সন্তানহারা হচ্ছেন, প্রিয়জনকে হারাতে বাধ্য হচ্ছে প্রায় প্রতিটি পরিবার। মহিলাদের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। জিএসটি চাপানোর পর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্কট বেড়েছে। এ সব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে নতুন প্রজন্ম, প্রশ্ন তুলছেন সচেতন ভোটাররা। তারা গণহত্যার সময় অত্যাচারিতা বিলকিস বানোর অপরাধীদের জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলছেন। তারা প্রশ্ন তুলছেন, ভুয়ো সংঘর্ষে খুনের মামলা, খোদ বিজেপি নেতা হরেন পাণ্ড্য হত্যা মামলার সঠিক মীমাংসা হল না কেন?

তার উত্তর নেই নেতা-মন্ত্রীদের কাছে। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২০০২-এর গণহত্যার কথা তুলে সংখ্যালঘুদের কার্যত হুমকি দিয়েছেন এবং সংখ্যাগুরুদের মধ্যে নতুন সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে ভোট কুড়োতে চাইছেন। এভাবে দু'পক্ষেরই ভোট নিশ্চিত করার পুরনো নোংরা খেলাই আবারও খেলতে চাইছে বিজেপি। আর কোন শান্তির কথা বলছেন তারা? গণহত্যার পর যে শ্মশানের শান্তি নামে তার কথাই কি বলতে চাইছেন? তা তো বিজেপি শাসনে ইতিমধ্যেই সারা দেশে জারি হয়েছে।

রাষ্ট্রবাদী হিন্দুত্ব
মন্দির বনাম গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার

২০১৪ সালে দেশের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের পর পার্লামেন্ট ভবনের দরজায় ভাবী প্রধানমন্ত্রীর সাষ্টাঙ্গ প্রণামের স্থির চিত্র কিম্বা লাইভ টেলিকাস্ট সারা দেশ দেখেছিল। এই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের আত্মনিবেদন কিংবা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার প্রকাশ নয়, এর তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং গভীরতর। তাই সদাপ্রস্তুত সংগঠিত প্রচারযন্ত্র ঘটনাটিকে ব্যাপক ভাবে পরিবেশন করেছিল। দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রীর কাছে পার্লামেন্ট ভবনও এক দেবমন্দির! গণতন্ত্রের প্রতি কি অচলাভক্তি! দেশবাসী নাকি মুগ্ধ!

তারপর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছু দিন পরে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের গঙ্গা আরতির মধ্য দিয়ে তাঁর 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য সহচর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে এ এক নতুন যুগের সূচনা। তিনি বলেছেন স্বাধীনতার পর মোদিজি ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত হিন্দু গৌরব ফিরিয়ে আনতে কেউ উদ্যোগ নেয়নি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই নতুন যুগের সূচনা করেছেন।

ইতিমধ্যেই আরও একটি নির্বাচনে জয়লাভের মধ্যে দিয়ে সেদিনের ভাবী প্রধানমন্ত্রীর শাসনের আট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। শুধু সংসদ ভবন নয়, প্রায় সারা দেশটাই ইতিমধ্যে মন্দিরময় হয়ে উঠেছে। শুরু হয়ে গেছে নাকি নতুন যুগের!

রাজকোষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে মন্দির নির্মাণের পেছনে। অত্যাধুনিক সেই সব নির্মাণ প্রকল্পের বৈভব, তার যাতায়াতের ঝাঁ চকচকে করিডর, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত নিরাপত্তারক্ষী সহ আনুষঙ্গিক আয়োজনে রাষ্ট্রের, শাসক এবং শাসক দলের পরাক্রম অত্যন্ত প্রকট। শুধু নতুন মন্দির নির্মাণ নয়, এ প্রকল্প তথাকথিত নতুন রাষ্ট্রবাদী হিন্দুত্ব নির্মাণেরও। সেই সব অসংখ্য মন্দির নির্মাণের মধ্যে গত দুই বছরের কয়েকটির অর্থ বরাদ্দ দেখলেই তা বোঝা যায়।

উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির ৮৫০ কোটি টাকা, কালিকা মাতা মন্দির ১২৫ কোটি টাকা, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ৭৫০ কোটি টাকা, অযোধ্যা ১৮০০ কোটি, গুজরাটের সূর্য মন্দির ৩৯০০ কোটি ইত্যাদি। এই বিপুল খরচের বাইরেও দেশের হিন্দু মন্দির পুনরুদ্ধার, পুনর্নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও প্রতি বছরের ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

শুধু দেশের মধ্যেই নয় বিদেশেও হিন্দু মন্দির নির্মাণে শত শত কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে। হিন্দুত্বের ধ্বজা ওড়ানোর উদ্যোগে অঢেল টাকা ঢালা হচ্ছে বাহরিন আবুধাবি এমনকি পাকিস্তানেও। ভাবলে অবাক হতে হয়, এই এক একটি মন্দির নির্মাণের বিপুল অর্থে কত ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যেত। কত মানুষের অপুষ্টি দূর করা যেত, প্রাণ রক্ষা করা যেত বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে থাকা কত মানুষের! সেই কবে ক্ষুধার্ত মানুষের দেওয়া রাজস্বের টাকায় মন্দির নির্মাণ আর অর্থহীন ধর্মাচরণকে কষাঘাত করে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'কোটি টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুর ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো ওই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো ওই ঠাকুর আটকুঁড়ির ব্যাটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন। এদিকে আসল ঠাকুর অন্ন বিনা বস্ত্র বিনা মরছে।' বিবেকানন্দই বলেছিলেন 'ফার্স্ট ব্রেড অ্যান্ড দেন রিলিজিওন'। রাষ্ট্রবাদী হিন্দুত্ববাদীদের সংজ্ঞায় এই বিবেকানন্দ কি হিন্দু? মনে তো হয় না!

এ তো গেল কেন্দ্রীয় উদ্যোগ। ভোটের বাজারে এর সাফল্য দেখে রাজ্যে রাজ্যে সরকারগুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছে একই কাজে। 'নরম হিন্দুত্ব' বা 'গরম হিন্দুত্ব'— সংবাদমাধ্যমের বানানো নামের প্যাকেজিং যাই হোক, ধর্ম জাতপাত নিয়ে রাজনীতির আখের গোছানোর সুযোগ-সন্ধানে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের সাথে অ-বিজেপি রাজ্য কিংবা এমনকি পশ্চিমবঙ্গেরও কোনও প্রভেদ নেই। শোষণ-অত্যাচার থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে, তাঁদের নাগরিক অধিকারগুলি কেড়ে নিয়ে বা বঞ্চিত করে রেখে ও তাদের বন্ধু সেজে থাকতে ধর্মীয় উন্মাদনা জাতপাত ধর্ম-বর্ণকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যেকার বিভেদ ও অনৈক্যকে লালন পালন করা কেন্দ্র-রাজ্যের প্রতিটি শাসক দল শুধু নয়, সংসদীয় নির্বাচনসর্বস্ব প্রতিটি দলেরই আজ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনমনে ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মননের অভাব শাসকদের এই সুযোগ এনে দিয়েছে। কারণ নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে জনগণের সচেতনতার সাথে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে ভিত্তি করে নবজাগরণের তথা পার্থিব মানবতাবাদের চিন্তা তুলে ধরেছিলেন। সত্যিকার নবজাগরণের সেই চিন্তা তথা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের চর্চা এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসকামী নেতৃত্ব কোনও দিনই চায়নি। জাতপাত ধর্ম-বর্ণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগ্রাম এড়িয়ে গিয়েছিলেন আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী আপসকামী নেতৃত্ব। কারণ সামাজিক ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক আন্দোলন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁদের ক্ষমতা লাভের অন্তরায় হবে এ আশঙ্কায় তাঁরা ছিলেন আতঙ্কিত। ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশ, আসফাক-উল্লাহ খান, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্রের রাজনীতির সাথে আপসপন্থী গান্ধীবাদী নেতৃত্বের তীব্র বিরোধিতার কারণ নিহিত ছিল এখানেই। বলা বাহুল্য যে এ লড়াইতে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণপন্থীরা সক্ষম হয়েছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই দুর্বলতা স্বাধীন ভারতেও জাতপাত ধর্ম-বর্ণের বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতার বীজ থেকে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

স্বাধীনতার পর থেকে বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী স্বার্থে ধর্ম জাতপাতকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করা, অন্য দিকে জনগণের অসচেতনতা— এ দুই-এর যোগফলেই সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রীয় হিন্দুত্ববাদ কিংবা মন্দির রাজনীতির উর্বর ক্ষেত্র।

তাদের রাজনীতির জয়ে উল্লসিত আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত একটি মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেছেন, করোনা অতিমারির সময় গোটা বিশ্ব এই সংকটের উত্তর খুঁজেছে, কিন্তু কেউ পায়নি। এ পর্যন্ত দুনিয়ার দুটি বিশ্বব্যবস্থা (অর্থাৎ পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র) ব্যর্থ হয়েছে। তৃতীয় কোনও বিকল্প আছে কি? তিনি বলেছেন, হ্যাঁ এই মন্দির নির্মাণ হল সেই বিকল্প পথের বার্তাকে দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতি এখন তাদের বিপুল কর্মকাণ্ডে পরিণত।

তাই তথাকথিত নতুন যুগের বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্বিদিকে। সাধারণ মানুষের অসহায়তার সুযোগে তাদের সরল ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় ছোট বড় অসংখ্য মন্দির গড়ে উঠেছে। রাম, কালী, সন্তোষী, হনুমান, গণেশ আরও কত দেবতা। রাস্তার মোড়, একটুখানি ফাঁকা জায়গা, দরকার হলে রাস্তা দখল করেই চলছে মন্দির নির্মাণ। বুথে বুথে মন্দির কমিটি। শাসক বিরোধী সকলেই সেখানে প্রতিযোগিতায় মত্ত। ক্লাবগুলিও এখন মন্দির হয়ে উঠেছে। ছিটেফোঁটা উৎসাহ ভাতা মিলছে। ধর্ম আর ভক্তির হাত ধরে, মস্তানি, চাঁদার জুলুম, তোলা আদায়, সিন্ডিকেট, বাহুবলী রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত, তাকে কেন্দ্র করে দলাদলি মারামারি, বছরভর রাজনীতি। 'নতুন যুগ' গড়ে তোলার এক অভিনব সোসাল ইঞ্জিনিয়ারিং!

শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণা কেন্দ্রেও মহাভারত গীতা বেদমন্ত্র পাঠ পঞ্চভূতের গবেষণা শুরু হয়েছে হইহই করে।

এদিকে দেশে চূড়ান্ত বেকারি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি। শুধু তাই নয়, সংকট কৃষি শিল্প বাণিজ্য সহ অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রেই। এর সাথে শাসকদের চরম ভ্রষ্টাচার, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, সমস্ত মানুষের বিশেষ করে নারীর নিরাপত্তাহীনতা, শিশুমৃত্যু, ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার ঘটনা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলেছে। মানুষের চোখের জল, হাহাকার, প্রার্থনা কোনও কিছুতেই কোনও ঐশ্বরিক সুবিচারের দেখা মিলছে না।

পৃথিবীব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই সংকট। কিন্তু ভারতের অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রায় সব থেকে খারাপ। ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যার নিরিখে তার স্থান পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলঙ্কা এমনকি আফ্রিকার বেশ কিছু দেশের চেয়েও খারাপ। ১২১টি দেশের মধ্যে তার স্থান ১০৭ নম্বরে। শিশুমৃত্যুর হারে ভারত পৃথিবীর শীর্ষে। গত দুই বছরে কোভিড অতিমারির কারণে সারা বিশ্বে যত মানুষ রুজি রোজগার হারিয়ে গরিব হয়ে পড়েছেন তার ৮০ শতাংশ ভারতীয়। মানবউন্নয়ন সূচকে ১৯১টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩২ তম। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য যখন সরকারি সহায়তা একান্ত প্রয়োজন তখন ক্রমাগত তেলের দাম, গ্যাসের দাম, রেলভাড়া বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর জিএসটি বসানো, সার বীজ কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধির মতো পদক্ষেপ করে সরকার নিঃস্ব মানুষকেই লুঠ করছে। আম্বানি-আদানিরা হয়ে উঠছেন সমাজের সমস্ত সম্পদের মালিক। সর্বাত্মক আক্রমণে মানুষ দিশাহারা। উদয়াস্ত পরিশ্রম নয়, সূর্যোদয় থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেও জীবিকার সংস্থান করে ওঠা যাচ্ছে না।

পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়িতে প্রবল পারদর্শী হলেও সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি শোষণ অত্যাচার ও প্রতারণার এই রাজনৈতিক প্রকরণটিকে পরিহার করার কথা ভাবতেই পারে না। জনগণকে তার নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার কাজ তাই তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অঙ্গ নয়।

গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে ভক্তি অন্ধবিশ্বাস, অন্ধআনুগত্যের কোনও জায়গা নেই। তারা ভুলে বসে আছেন যে চিন্তায়, বৈষয়িক উৎপাদনে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতেই গণতন্ত্রের সৃষ্টি। গণতন্ত্রের শাসক কোনও রাজা বা সম্রাট নন। তিনি বিমূর্ত কোনও ঈশ্বরের নন, জনগণেরই প্রতিনিধি। সুনির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে দায়বদ্ধও। সমস্ত নাগরিকের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনের নিরাপত্তা এবং নাগরিক সম্মান প্রতিটি মানুষেরই প্রাপ্য। সে প্রাপ্য শাসকের প্রার্থনায় ঈশ্বরের দান হিসেবে ঝরে পড়ে না। শাসকের রোজগার, নিজস্ব সঞ্চয় কিংবা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পূর্বপুরুষের সম্পত্তি থেকেও তিনি তা বিলিবন্টন করেন না। জনগণের শারীরিক ও মানসিক শ্রমেই সে সমস্ত সম্পদ, তার উৎপাদনের উপকরণগুলির সৃষ্টি। সেই সমস্ত স্থায়ী-অস্থায়ী সম্পদ সহ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির উপর নাগরিকদের অধিকারের ভিত্তিও সেটাই। সেই অধিকার বোধই তার আত্মমর্যাদার জায়গা। সেখানেই তো প্রজার সাথে নাগরিকের পার্থক্য। জনগণের এই সচেতনতার ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগঠিত করতে গেলে বাস্তবে এই প্রতারণামূলক ব্যবস্থাটির স্বরূপ উন্মোচন করতে হবে। দাঁড়াতে হবে তার বিরুদ্ধেই। ভোটবাজ দলগুলির নেতারা, তাঁরা শাসক বা বিরোধী যে আসনেই থাকুন, এই ব্যবস্থাকে পাল্টানোর কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। কারণ উভয়েই শাসক শ্রেণিরই প্রতিনিধি, এই ব্যবস্থাটির রক্ষক।

সাতের পাতায় দেখুন

নির্বাচন কমিশন সরকার-ভজা

একের পাতার পর

জন্য একজন 'নিজেদের লোক' বেছে নেওয়ার জন্যই কি এই তড়িঘড়ি?

অতীতেও বারবার দেখা গেছে নির্বাচন কমিশনের মতো একটি নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থাকে সরকারি দলগুলি বারবার নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলিও নির্বাচন কমিশনকে একই ভাবে নিজ নিজ স্বার্থে কাজে লাগিয়ে আসছে। এই কদিন আগেই দেশের মানুষ দেখল হিমাচল প্রদেশের সাথে একই সঙ্গে গুজরাট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও কী নির্লজ্জ ভাবে শাসক বিজেপিকে সুবিধে পাইয়ে দিতে গুজরাটের নির্বাচন ঘোষণা পিছিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। যত দিন পর্যন্ত না প্রধানমন্ত্রীর সব শিলান্যাস, প্রকল্পের উদ্বোধন শেষ হয়েছে তত দিন নির্বাচনের দিন ঘোষণা আটকে রাখা হয়েছে। বাস্তবিক কংগ্রেস আমল থেকেই নির্বাচন কমিশনকে এ ভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার হয়ে আসছে। এ রাজ্যেও সিপিএমের আমলে নির্বাচনের নামে ছাপ্পা, বুথ দখল, সন্ত্রাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যখন নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে, জনগণ যখন কমিশনের কাছ থেকে একটা কড়া পদক্ষেপ আশা করেছে, তখন প্রায় সব সময়ই দেখা গেছে নির্বাচন কমিশনের ফাটা রেকর্ড বেজেছে— দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন শান্তিপূর্ণই হয়েছে। তৃণমূল শাসনে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্য জুড়ে প্রবল সন্ত্রাস তৈরি করে বিরোধীদের দাঁড়াতেই দেওয়া হয়নি। কয়েক মাস আগে কলকাতা কর্পোরেশন সহ রাজ্যের সর্বত্র নির্বাচনে দুষ্কৃতীদের রিভলবার হাতে ছোটাছুটির ছবি টিভিতে এবং খবরের কাগজে ছাপা হলেও এ-সব কোনও কিছুই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের চোখে পড়েনি। অর্থাৎ ভোটসর্বস্ব সংসদীয় দলগুলি যে যখন সুযোগ পায় নির্বাচন কমিশনকে ঠুঁটো করে রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগায়। স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। জনগণ ধরেই নিয়েছে, যে যখন যেখানে ক্ষমতায় থাকবে এ ভাবেই কমিশনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে।

অবশ্য গণতন্ত্র জাহান্নামে গেলেও এই সব দলগুলির কিছু যায় আসে না। শুধু নির্বাচন কমিশনই বা কেন, নিরপেক্ষ প্রায় সব সংস্থাগুলিতেই বিজেপি-আরএসএস নিজেদের লোক বসিয়ে সেগুলিকে কুক্ষিগত করছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিক্যাল রিসার্চ থেকে বিজ্ঞান কমিশন সব জায়গাতেই এখন আরএসএসের লোক। সমস্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএসএসের লোকদেরই উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। হাইকোর্টের বা সুপ্রিম কোর্টের যে বিচারপতিরা নিরপেক্ষ ভূমিকা নিচ্ছেন বা যাঁদের রায় সরকারের পছন্দ হয়নি তাঁদের বদলি করে দেওয়া হচ্ছে বা পদোন্নতি আটকে রাখা হচ্ছে। ঠিক একই রকম ভাবে বিজেপি-আরএসএসের হিন্দুত্বের কর্মসূচি কার্যকর করতে নতুন ইতিহাস লেখার নামে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাতে ইতিহাস কমিশনকে কাজে লাগানো হচ্ছে। যেমন অযোধ্যার রামমন্দিরে রামের মাথায় সূর্যের প্রথম আলো ফেলতে কাজে লাগানো হচ্ছে সিএসআইআর-কে। অথচ এই বিজ্ঞান সংস্থাটি গড়েই উঠেছিল জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচিন্তাকে ছড়িয়ে দিতে। বাস্তবে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে অন্ধতা আর কুসংস্কার ছড়াতে। ফলে নির্বাচন কমিশনে নিজেদের পছন্দের লোক বসিয়ে নিয়মকানুন-বিধি সব যেমন শাসকদের পছন্দমতো তৈরি হয়ে যাচ্ছে, বিজেপি নেতারা চরম অন্যায়, অগণতান্ত্রিক, বেআইনি কিছু করলেও কমিশন ঠুঁটো হয়ে থাকছে, তেমনই বিরোধীদের শায়েস্তা করতে কমিশনকে অতি তৎপর ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে।

এই রকম পরিস্থিতিতে নানা মহল থেকে নির্বাচন কমিশনের নিয়োগে স্বচ্ছতা চেয়ে এবং যাতে নির্বাচন কমিশন দলীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পরিচালিত না হয়, যাতে তা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে, সেই আবেদন নিয়ে একগুচ্ছ মামলা হয়েছিল। এই মামলাতেই সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ, নির্বাচন কমিশনার এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বেছে নেওয়ার প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের ধাঁচে কলেজিয়াম ব্যবস্থা চালু করা যায় কি না এবং সেই প্রক্রিয়ায় প্রধান বিচারপতি উপস্থিত থাকতে পারেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে।

বাস্তবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চালু রাখার একটি অন্যতম অঙ্গ হিসাবে এসেছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদী চরিত্র অর্জন করার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সব অঙ্গকেই আজ দু-পায়ে মাড়িয়ে চলেছে। পুঁজির চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়ে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারও আজ পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে বর্জনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষায় শাসক দলগুলি যে নগ্ন ভূমিকা নিয়ে চলেছে তাতে জনস্বার্থকে নগ্ন ভাবে বলি দেওয়া হচ্ছে। তাই শাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে জনগণের সমর্থন লাভ আজ আর তাদের কারও পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। কারচুপি, জালিয়াতি, অর্থবল, পেশির জোর, পক্ষপাতদুষ্ট মিডিয়ার ব্যবহার ছাড়া জেতার তাদের আরও কোনও রাস্তাই খোলা নেই। এই রকম অবস্থায় স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন স্বাভাবিক ভাবেই শাসকদের ঘোর অপছন্দের।

কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করে ক্ষমতায় টিকে থাকা শাসক দলগুলির নির্বাচন কমিশনকে এমন ইচ্ছামতো ব্যবহার জনগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। স্বাধীন চিন্তামতো ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। বুর্জোয়া শ্রেণি আজ নিজেদের তৈরি সংবিধানকে নিজেরাই মাড়িয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের সাথেই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার দাবি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং জরুরি।

বঞ্চনার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কন্ট্র্যাকচুয়াল কর্মীদের কনভেনশন

কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের ডাকে ছাঁটাই, কম বেতন দেওয়া, অন্যায় ভাবে বদলি করা, বোনাস কম দেওয়া প্রভৃতির প্রতিবাদে ২৬ নভেম্বর কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার কন্ট্র্যাকচুয়াল কর্মীদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার শহরে। ২৭ নভেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কনভেনশন হয় বালুরঘাট প্রেস ক্লাব হলে।

সারা ভারতে দলের আন্দোলনের খবর পেতে এস ইউ সি আই (সি)-র অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ফলো করুন

কোচবিহারে মূল প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন গৌরীশঙ্কর দাস, বিপুল ঘোষ, জয় লোধ, গোপাল দেবনাথ, গোবিন্দ পাল, মনিলাল রবিদাস, বাবলু বর্মন ও অন্যান্য প্রতিনিধিরা। কনভেনশন থেকে মনিলাল রবিদাসকে আহ্বায়ক করে পাঁচজনের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

বালুরঘাট প্রেস ক্লাব হলে কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন গৌরীশঙ্কর দাস, গোপাল দেবনাথ, গোবিন্দ পাল, সাগর সরকার, অমৃতা বর্মন, অলিপ সরকার সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা। সাগর সরকারকে আহ্বায়ক করে ছয় জনের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। উভয় সভাতেই ফোরামের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল ও নারায়ণ পোদ্দার কনভেনশন সফল করার জন্য অভিনন্দন জানান।

রাষ্ট্রবাদী হিন্দুত্ব

ছয়ের পাতার পর

এই সংসদীয় রাজনীতিতে তথাকথিত বিরোধীরাও কথায় কথায় বর্তমান শাসক দলের ফ্যাসিবাদী আচরণের কথা তোলেন। আচরণ যে ফ্যাসিবাদ সুলভ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বারা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পিষে মারা, পুঁজিবাদের ক্রমাগত সেবা করে অর্থনীতির চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণে সাহায্য করা, জনগণের ঘাড়ে সমস্ত রকমের শোষণ চাপিয়ে দেওয়া— এতে তাদের বিরাম নেই। মালিক শ্রেণি কলকারখানা চালানোর জন্য বিজ্ঞানের কারিগরি দিকটি ব্যবহার করলেও চিন্তা ভাবনায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কারের সব রকমের চর্চা ইত্যাদি এই ধরনের প্রতিটি পদক্ষেপই ফ্যাসিবাদের লক্ষণ। এগুলি আজ যে দল ক্ষমতায় আছে, থাকতে চায়, তারাই করে। কারণ পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থাটির স্বার্থ রক্ষা করতে হলে আজ জনবিরোধী বা ফ্যাসিবাদী এই পদক্ষেপগুলি না করে তাদের উপায় নেই। সে কারণেই প্রতারণা এবং অত্যাচার এদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক প্রকরণ। ভোটের প্রচারে মুখে যাই বলা হোক, শাসক হিসেবে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল বা রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন আঞ্চলিক দলগুলি এমনকি তথাকথিত বামপন্থী সিপিআই সিপিএম— এই দিক থেকে সকলেই একই পথের পথিক।

জনগণের এই তিক্ত উপলব্ধির কথা এইসব দলের নেতা-কর্মীরা কতটা বুঝতে পারছেন, কতটা জেগে ঘুমোচ্ছেন বা কতটা মোদির ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপের সমালোচনা করতে করতেই মোদিকে অনুকরণ করে মোদিরই বিকল্প হওয়ার চেষ্টা করছেন সেটা তাঁরাই সবচাইতে ভালো জানেন। তাঁরা ভাবেন রাজনীতি মানে জনগণকে বোকা বানানোর খেলা এবং সে খেলায় তাঁরাই কখনও জিতবেন কখনও হারবেন। আর চিরকাল এই শোষণমূলক নিষ্ঠুর ব্যবস্থার মহিমাময় মন্দিরটি অটুট থাকবে। কিন্তু তাঁরা ভাবেন বলেই তা ধ্রুব সত্য হয়ে উঠবে এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। তাঁদের মনে করার দ্বারা ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারিত হয় না।

জনগণ কোনও কিছুই ধরতে পারছে না, কিছুই বুঝতে পারছে না, প্রতিটি জুমলা অব্যর্থ ভাবে কাজ করছে মনে করে আপাতত তারা অত্যন্ত উল্লসিত। কিন্তু তাদের উল্লাস ও তৃপ্তি যাই হোক, সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার কঠোর সংগ্রাম কালক্রমে মানুষের কাছে অনেক কঠিন ও জটিল বিষয় স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে তোলে। তার লক্ষণও ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে বারবার। জনসাধারণের ক্ষোভ শাসকের বিরুদ্ধে যে পুঞ্জীভূত বিস্ফোরণের আকার নিচ্ছে তার প্রকাশ ঘটছে মাঝেমাঝেই। আতঙ্কিত শাসক শ্রেণি দমননীতি নামিয়ে আনছে মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশে, নাগরিক অধিকারে, সাংবাদিকের স্বাধীনতায়। কিন্তু জীবন ও জীবিকার তাগিদে হাজার দমন পীড়ন অত্যাচার সত্ত্বেও মানুষকেই নামতে হয় প্রাণপণ লড়াইতে। ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের পক্ষে জনগণের এই যন্ত্রণা কিংবা লড়াইতে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তথাকথিত এই বিরোধীদের ভোটসর্বস্ব রাজনীতি একই রকম ভাবে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষারই রাজনীতি। জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের ভোট আদায় করে পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করাই এই রাজনীতির মূল চরিত্র। তাই শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন সহ সমস্ত অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদবিরোধী যথার্থ গণআন্দোলনের শক্তিই জনগণের লড়াই ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

মধ্যপ্রদেশে কৃষক সম্মেলন

কৃষক-বিরোধী সরকারি নীতি ও বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল-২০২২ প্রতিরোধে এবং নারায়ণপুরা চিনি কারখানা আবার চালু করার দাবিতে মধ্যপ্রদেশের গুনায় ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল এআইকেকেএমএস-এর প্রথম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনে গুনা ছাড়াও অশোকনগর, দেবাস, গোয়ালিয়র, সাগর, ইন্দোর, ভোপাল, রায়সেন, শিবপুরী প্রভৃতি জেলা থেকে কৃষক প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

কৃষক-শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন এআইকেকেএমএস নেতা মনীশ শ্রীবাস্তব। বক্তব্য রাখেন উত্তরপ্রদেশের কৃষক-নেতা শৈলেন্দ্র কুমার। প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সদস্য প্রদীপ আর বি। সভাপতিত্ব করেন উমাপ্রসাদ বিশ্বাস। সম্মেলন থেকে উমাপ্রসাদ বিশ্বাসকে সভাপতি ও মনীশ শ্রীবাস্তবকে রাজ্য সম্পাদক করে সংগঠনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় ওয়েবিনার

হিন্দি জোর করে চাপানোর বিরুদ্ধে মত দিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা

ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে চাপানোর বিরুদ্ধে ২৭ নভেম্বর অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে সর্বভারতীয় ওয়েবিনারে দেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদরা সরব হন। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক করুণানন্দন বলেন, এদেশে জাতীয় সংগ্রাম এবং দেশাত্মবোধ গড়েই উঠেছিল ইংরেজিকে নির্ভর করে। পাঞ্জাব, গুজরাট, বালুচিস্তান, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, বাংলার মধ্যে যোগাযোগ হিন্দি বা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে নয়, গড়ে উঠেছিল ইংরেজির মাধ্যমে।

ধর্ম, বর্ণের বিভাজনের মতোই আজ নাগরিকদের হিন্দিভাষী ও অহিন্দিভাষী এই দুটো ভাগে ভাগ করার চেষ্টা চলছে, যা উচিত নয়। এসবের দ্বারা দেশকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র বানানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক গণেশ এন ডেভি বলেন, আমাদের দেশের জাতীয় নেতারা বুঝেছিলেন, ভাষায় বৈচিত্র্য অনুযায়ী ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করতে হবে। ১৯২৬ সালে কংগ্রেসে এ বিষয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পর অষ্টম তফসিলে ২২টি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে দেশকে বহুভাষী রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, যাদের মাতৃভাষা হিন্দি বলা হচ্ছে তাদের অনেকেরই হিন্দি দ্বিতীয় মাতৃভাষা। পাঁচ কোটি ভোজপুরী ভাষীর মতো উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, পাঞ্জাব, ঝাড়খন্ড প্রভৃতি রাজ্যেও 'দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিন্দি'র নজির রয়েছে। বাস্তবে দেশের ৭২ শতাংশ মানুষই অহিন্দিভাষী। এদের উপর জোর করে হিন্দি চাপানো উচিত নয়।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শচীদানন্দ সিনহা বলেন, ভারতের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমের ঐক্যকে সুদৃঢ় করেছে শুধু ইংরেজি নয়, অন্যান্য ভাষায় আদান-প্রদান। এক ভাষা নয়, হিরে-মতি-জহরতের মতো নানা ভাষাকে মালার মতো গেঁথে ভারতে একতার সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

আইআইটি মুম্বাইয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক রাম পুনিয়ানি বলেন, ইংরেজিকে বাতিল করে হিন্দি চাপানোর অপচেষ্টা একটি বিপজ্জনক বিষয়। হিন্দুত্ববাদীরা আজ উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্য তা ব্যবহার করছে। এক সময়ের মুসলিম মৌলবাদীদের দ্বারা উত্থাপিত 'উর্দু-মুসলিম-পাকিস্তানে'র মতো আজ হিন্দুত্ববাদীরা 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান'-এর স্লোগান ব্যবহার করছে। অথচ ধর্মকে ভাষার সাথে যুক্ত করা কোনও মতেই উচিত নয়। অধ্যাপক পুনিয়ানি বলেন, মধ্যপ্রদেশ সরকার চিকিৎসাবিদ্যা হিন্দি ভাষার মাধ্যমে চালু করার জন্য অ্যানাটমির যে হিন্দি পুস্তক প্রকাশ করেছে তা আসলে দেবনাগরী বর্ণমালায় লেখা ইংরেজি পুস্তক ছাড়া কিছু নয়। হিন্দি ভাষা চাপানোকে আজ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা। ওয়েবিনারের সঞ্চালক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপর জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দিতে চাইছে তার বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে। উচ্চশিক্ষায় জোর করে হিন্দি চাপালে এমনকি হিন্দিভাষী ছাত্রছাত্রীরাও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি ২৯ ডিসেম্বর চেন্নাইতে সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে কনভেনশন করতে চলেছে। অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও হিন্দি জোর করে চাপানোর বিরুদ্ধে সেমিনার, প্রতিবাদ সভা প্রভৃতি সংগঠিত হবে। তিনি দেশের মানুষকে এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানকে মেলানোর অপচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের

প্রতিবাদী বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন এসইউসিআই(সি)-র

২০ নভেম্বর বিজ্ঞান সংস্থা কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) তাদের একটি পরিকল্পনা সম্পর্কে টুইট করে। টুইটে জানা যায়, সিএসআইআর-এর অন্তর্ভুক্ত একটি ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীদের আয়না ও লেন্স সাজিয়ে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, যাতে প্রতি বছর রামনবমীতে অযোধ্যায় রামলালার মূর্তির মাথায় প্রথম সূর্যরশ্মি এসে পড়ে। এই ঘটনা স্বভাবতই বিজ্ঞানীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দু'শো জন বিজ্ঞানী একটি খোলা চিঠির মাধ্যমে নিজেদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ নভেম্বর একটি বিবৃতিতে বিজ্ঞানীদের এই প্রতিবাদ জ্ঞাপনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

খোলা চিঠিতে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এমন একটি ব্যবস্থা নির্মাণ স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত পাঠাভ্যাস হতে পারে কিন্তু মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ঘটানো এর লক্ষ্য নয়। জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করা অর্থের এই নির্লজ্জ অপব্যয়ের নিন্দা করেছেন বিজ্ঞানীরা। সূর্যের আলো দেবমূর্তির মাথায় ফেলার এমন একটি অতি-সহজ ব্যবস্থা তৈরিতে বিজ্ঞানীদের ব্যবহারের কার্যকারিতা নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন। বাস্তবে এ হল বিজেপি সরকারের হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডার একটি অঙ্গ যেখানে অধ্যাত্মবাদী কর্মসূচি সফল করতে প্রযুক্তিবিজ্ঞান ব্যবহার করা হল। বিজ্ঞানচেতনা বিরোধী এই ঘটনাটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, সঠিক বিজ্ঞানচেতনা অনুযায়ী যা করা উচিত, বিজেপি সরকারের কম্পাসের কাঁটা তার দিকনির্দেশ করে না। তার অভিমুখ হল ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞানের যে ধরনের অপব্যবহার তাদের প্রয়োজন, সেই দিকে।

বিবৃতিতে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, প্রতিবাদী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত হয়ে, বিজ্ঞান গবেষণার নামে এই চাতুরীর বিরুদ্ধে তাঁরা যে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন, তার প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাই। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের কারিগরি দিকটি মিলিয়ে দিয়ে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি কায়েমের যে অপচেষ্টা বিজেপি সরকার চালাচ্ছে, আমরা তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

সম্মান আদায় করলেন কালনার আশাকর্মীরা

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমা হাসপাতালে আশাকর্মীরা প্রতিনিয়ত অবমাননার শিকার হচ্ছেন। প্রসূতি মা-দের ভর্তি করাতে নিয়ে গেলে সেখানে কিছু সংখ্যক নার্স, ডাক্তার এবং স্টাফ আশাকর্মীদের নানাভাবে হয়রান করেন, সই দিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেরি করেন, তাঁদের লিফটে উঠতে ও জুতো পরে ঢুকতে দেওয়া হয় না, ভেতরে কোথাও বসতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না।

দীর্ঘদিন ধরে এই হয়রানির প্রতিবাদে ২৫ নভেম্বর কয়েকশো আশাকর্মী হাসপাতাল সুপার-কে ঘেরাও করেন ও ডেপুটেশন দেন। আন্দোলনের চাপে সুপার অভিযুক্ত স্টাফদের ডেকে জবাবদিহি চাইলে তাঁরা নিজেদের ভুল স্বীকার করেন। এরপর তিনি নার্স সুপারিনটেনডেন্ট-কে ডেকে নার্সদের দুর্ব্যবহারের ঘটনাগুলি উল্লেখ করেন। তিনিও ঘটনা স্বীকার করেন। এই অবস্থায় আশাকর্মীদের বসে লেখালেখির কাজ করার জন্য আলাদা ঘর বরাদ্দ করা হয় এবং ভেতরে ঢুকে লিফট ব্যবহার করারও অনুমতি দেওয়া হয়। সুপার জানিয়েছেন, এরপরেও কোনও অসুবিধা হলে তাঁর কাছে লিখিতভাবে তা জানাতে।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন বলেন, বহু জায়গাতেই আশাকর্মীদের উপর এই ধরনের অবমাননার ঘটনা ঘটছে। সংগঠিত আন্দোলনই এর সুরাহার একমাত্র পথ।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

গণদাবী পড়ুন ও গ্রাহক হোন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com